পরক্ষণেই বিচিত্রার মনে আশঙ্কা জাগল লোকটি যদি আজকে না আসে। গত কয়েক মাস ধরে ভদ্রলোকটির মধ্যে খুব irregularity লক্ষ্য করছে বিচিত্রা। এর ফলে আজকাল আর নিয়মিত সীট-প্রাপ্তিতেও ব্যাঘ্যাত ঘটছে। এ সপ্তাহেও প্রতিদিন আসেনি। হয়ত কোনো সমস্যায় পড়েছে। অসুখ-বিসুখও হতে পারে। বয়স তো ষাটের কাছাকাছিই মনে হয়। আজকে অবশ্য মাসের শেষ দিন। সরকারী অফিসে বেতনের দিন। তবে তো তাঁর আসা উচিত।

আজ বাসটা ঠিক ন' মিনিট লেটে আসল। এতই ভীড় যে ওঠাই মুস্কিল। কিন্তু আজকে বিচিত্রাকে যে করেই হোক উঠতেই হবে। আজকের একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে সে। ভদ্রলোকটি কি আজ এসেছে? ভীড় বাসে ঠাওড় করা মুস্কিল। ভীড়ের মধ্যে এত ধস্তা-ধস্তি হচ্ছে যে ঠিকমতো দাঁড়ানো যাচ্ছে না। প্রায় মিনিট পাঁচেক পর বাসের পেছনের দিক থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, 'এই যে ম্যাডাম, এদিকে'। বিচিত্রা মনে মনে আস্বস্ত হল। কিন্তু আজ পঞ্চাশোর্ধ বিচিত্রার মনে যেন এক ষোড়শীর দুষ্টু বুদ্ধি খেলা করছে। সে আজ ঠিক করেছে যে, কিছুতেই সে আজ সীট ধরতে পেছনে যাবে না।

এই তেরোটা বছর যে জিনিসটা বিচিত্রা করে এসেছে যে, লোকটির ডাক শুনে সীটের আশায় ভীড় ঠেলে গেছে, আর ভদ্রলোক বিচিত্রার অনুকুলে সীট ত্যাগ করে Nest Stoppage-এ নামার তাড়ায় উল্টো দিক থেকে ভীড় ঠেলে গেটের কাছে এসেছে। পারস্পরিক Interaction-এর কোন পরিস্থিতিই তৈরী হয়নি।

কিন্তু এতদিন বিচিত্রার লক্ষ্য ছিল সীট। আজ লক্ষ্য ব্যক্তিটি। তাই বিচিত্রা গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল। যাতে কিছুক্ষণের না হলেও কথা বলার মতো পরিস্থিতি তৈরী হয়। ভদ্রলোক আর একবার ডাকলেন। বিচিত্রাও প্রত্যুত্তরে জানাল, 'আজ লাগবে না'। কিন্তু আওয়াজটি মনে হয় লোকটির কান পর্যন্ত পৌঁছল না। লোকটি এবার মনে হয় একটু বিরক্ত হয়েই সীটটি ছেড়ে দিয়ে ভীড় ঠেলে দরজার দিকে এগোতে লাগল। আর দেরি করলে তাকে আর Next Stoppage-এ নামতে হবে না। বিচিত্রাও গেটের কাছে নিজের পজিশন নিল। কিন্তু আজ প্রচণ্ড ভীড়। তার উপর লোকটি বিচিত্রার বসার আশায় সীট ছাড়তে দেরি করার পিছিয়ে পড়েছে। Stoppage প্রায় এল বলে। লোকটি প্রাণপনে চেষ্টা করছে ভীড় ঠেলে গেটের কাছে আসতে।

গেটের কাছাকাছি আসতেই বিচিত্রা মনের সমস্ত শক্তি এক করে বলে উঠল 'একটু শুনবেন?' ভদ্রলোক একবার তাকানোর চেষ্টা করল বলে মনে হল। কিন্তু ততক্ষণে বাস তার Stoppage-এ থেমে গেছে, আর নামার মানুষের চলও লোকটিকে ছিটকে বাস থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

বিচিত্রার মনের কথা মনেই থেকে গেল। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে, এখনও তো প্রচুর দিন বাকি। এক না এক দিন ঠিক সুযোগ করে নেবে সে। এই প্রথম ভীড় বাসে সুযোগ সত্ত্বেও সীট না পাওয়াতে তার মনে কোনো আফসোস হ'ল না।

পরের দিন বাস ধরতে যাবার সময় আগের দিনের কথা ভেবে বিচিত্রার মনে মনে খুব লজ্জা হ'ল। কি দরকার ছিল তার ওরকম টিন-এজারদের মতো আচরণ করতে যাবার। নিজের ইমেজটাও নষ্ট হল, আর লোকটিকেও অযথা কষ্ট পেতে হল। কিন্তু, তাহলে কি ভদ্রলোকটিকে বিচিত্রার আর কোনোদিন জানাই হবে না? সে যে এ রুটে আর কিছুদিনের অতিথি অন্ততঃ এ খবরটাতো লোকটিকে দেওয়া উচিত। যে করেই হোক পরিস্থিতি অনুযায়ী এ ক'দিনে ভদ্রলোকটিকে বিচিত্রার Crack করতেই হবে। বাস Stoppage-এ এসে বিচিত্রার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে নিজেকে কিছুটা নার্ভাসও লাগে।

আজকে বাস তুলনায় অনেকটাই ফাঁকা। কিন্তু কই সেই পরিচিত ডাক? কেউ তো আজ ডাকল না। বিচিত্রা তন্ন তন্ন করে সীটে বসে থাকা মুখগুলোকে খুঁজলো। না সে আজ নেই। আজকেও তাহলে ডুব মেরেছে। কালকেই একটু অসুস্থ বলে মনে হয়েছিল।

ছয়

আজ বিচিত্রার এ রুটে জার্নির শেষ দিন। প্রায় পনেরো বছরের দীর্ঘ ডেইলি প্যাসেঞ্জারীর ইতি ঘটবে আজ। কোথায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার কথা তা না সকাল থেকেই মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত। সেদিনের পর সেই ভদ্রলোকটির দেখা বিচিত্রা আর তার ডেইলি প্যাসেঞ্জারীর বাসে পায়নি। ধুমকেতুর মতই সে এসেছিল, আর বিদায়ও নিল ধুমকেতুর মত। শুধু বিচিত্রার মনে রেখে গেল এক অপার কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা। যার নিরশন আর ইহজন্মে হয়ত হওয়ার নয়।

এতদিন মনে তাও একটা ক্ষীণ আশা ছিল শেষ সাক্ষাতের। কিন্তু আজকের পর 'হে আমার দীর্ঘদিনের সীট-বন্ধু বিদায় তোমায়।' আচমকাই স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল বিচিত্রার মুখ দিয়ে।

সাত—আবার বর্তমানে ফেরা

'এই যে ম্যাডাম, এদিকে।'.....অগত্যা বিচিত্রা হাঁটা থামিয়ে কণ্ঠস্বরের অধিকারী ব্যক্তিটির অনুসন্ধানে মুখ ফেরালো।

কিন্তু ফুটপাথে যা মানুষের ভীড়, তার উপর ফুটপাথের স্বল্প আলো, বিচিত্রা কাউকে খুঁজে পেল না। এদিকে ঝড় আসছে। বিচিত্রা দেরীও করতে পারছে না।

কণ্ঠস্বরটি আবার ভীড়ের মধ্যে থেকে ভেসে এল। এবার বিচিত্রা যেন কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পেল। এ যেন মহাকালের ওপার থেকে হারিয়ে যাওয়া অতি পরিচিত কোনো ডাক। দীর্ঘ আট বছরে যা জীবনের দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতে ফিকে হতে হতে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিল, আজ তা কর্ণকুহরে বারংবার আঘাত করে স্মৃতির মরচেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে দীর্ঘ আট বছর আগের স্মৃতিকে বিচিত্রার চেতনায় উদ্ভাসিত করে তুলল। এই তো সেই ডাক, যা অন্ততঃ একবারের জন্য শোনবার আশায় বিচিত্রা এই ক' বছর আগে পর্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। এই তো সেই মানুষ যাকে পথমধ্যে হারিয়েও আর একটি বারের জন্য ফিরে পেতে মন আকুল হয়েছিল। যার মধ্যে নিহিত ছিল বিচিত্রার অগুনতি জিজ্ঞাস্য, অপার কৌতুহল। কই সে? সে কই?

ঝড়ের আশঙ্কায় ফিকে হতে থাকা ভীড়ে বিচিত্রা ধীরে ধীরে আবিষ্কার করল ফুটপাথের উল্টো প্রান্তে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনের এই পর্যায়ে এসে এভাবে মানুষটির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে বিচিত্রা তা কোনো কল্পনাতেও কোনোদিন ভাবতে পারেনি। যার সাথে জীবনের এতগুলো বছরের ডেইলি প্যাসেঞ্জারীতে কোনোদিন কোনো কথা বলা হয়ে ওঠেনি অথচ যাকে অনেক কিছু বলার ছিল, তাকে আজ এই মুহূর্তে কি বলে উঠবে বিচিত্রা? আর তিনিও বা কি বলবেন? কারণ আজকের মুহূর্তটা তো বাসের ভীড়ের মধ্যে ছেড়ে যাওয়া সীট তাড়াতাড়ি গিয়ে দখল করার মুহূর্ত নয়, এ তো পারস্পরিক কথোপোকথনের নির্ভেজাল মুহূর্ত। যার জন্য নিত্যযাত্রার শেষ দিকে আকুল হয়েছিল বিচিত্রা, আশ্রয় নিতে হয়েছিল কৈশোর সুলভ কলা-কৌশলের।

'মাসীমা, ফুটপাথে এভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বাড়ি যান। দেখছেন না প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি আসছে। কালবৈশাখী এল বলে।' হকার ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল বিচিত্রাকে লক্ষ্য করে। এদিকে ফুটপাথ জুড়ে আশ্রয় প্রত্যাশী মানুষের ছোটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, সঙ্গে কোলাহল। খুব জোরে বাতাস বইছে, সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। মহা দুর্যোগ আসন্ন প্রায়। ফুটপাথের লাইটগুলোও নিভে গেল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কোথায় গেল সে? ওই তো আবছা আলোয় তাঁকে বুঝি দেখা যায়। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে একটা বাজ পড়ল। বিচিত্রার চোখে সামনে চারিটা দিক কেমন যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

পঙ্ক - পাদ

সুরজিৎ বিশ্বাস

এ. ডি. এস. আর. (প্রবেশনার), দক্ষিণ দিনাজপুর

বীজ

মলাজড়িত কান্না কেঁদো না,
আকাশ করো রঙিন-তুলির
তানে।
তুমি আমি একই গাছের শিকড়
তোমার বীজ আমায় জাগ্রত
করে।

খিদের মতো

জড়ানো খিদের মতো তোমার অস্তিত্ব।
জলের দোকানের মতো অনাবিল।।
আমার সওদাগর শরীর এলিয়ে দিলাম।
বাতাসের আগাছা নহবৎ হয়ে বাজুক।।

বায়ুর ভিতর অলীক ধ্বনি শুনি।
সজাগ হয় দেবতার চোখ।।
চোখের ইশারা চুল দিয়ে ঢাকা।
প্যাঁচার গোঙানী রাত কেটে দেয়।।

কষ্ট

তোমার কথা ভাবি না আর,
ভাবলে কষ্ট হয়
তোমার জন্য।
আর আনন্দ হয়
আমার জন্য।
বস্তুত ঃ
দুতো অনুভূতি—
আমি এক সাথে
সহ্য করতে পারি না
তাই—
তোমার কথা ভাবব' না
আর।

যন্ত্রণা দাও

চার বছর ধরে
নিতের মধ্যে খুঁতেছি
তোমায়।
না পাওয়ার জ্বালা
কেন' কষ্ট দেয়
না আমায়।
তবে কি আমি কোনদিন
ভালোবাসিনি তোমায়।
তার মানে আমি
নিতে কে-ও ভালোবাসি না।

তবু কেন দুঃখ হয় না
আসে না বিষাদ,
বিরহে হই না কাতর।
একতু যন্ত্রণার জন্য কেঁদে
মরি।
কিন্তু তিলমাত্র দুঃখ
আসে না।
এই পাপ আমি কোথায় রাখি,
তোমার যন্ত্রণা আমায় দাও।
করে তোল' আমায়
পূণ্যবান—

''THROUGH me you pass into the city of woe :
Through me you pass into eternal pain :
Through me among the people lost for aye.
Justice the founder of my fabric moved :
To rear me was the task of Power divine,
Supremest Wisdom, and primeval Love.
Before me things create were none, save things
Eternal, and eternal I endure.
All hope abandon, ye who enter here."

[THE VISION OF DANTE, Hell, Canto III. Translated by the Rev H.F. Cary A.M.]

রূপসী কাশ্মীর

শ্রী গণেশ চন্দ্র দত্ত

জেলা অবর-নিবন্ধক, কোচবিহার

ব্যাপক জঙ্গী কার্যকলাপের ভয়-ভীতিতে, ভ্রমণপিপাসুরা প্রায় এক যুগ কাশ্মীরের সৌন্দর্যদর্শনে বিরত ছিলেন। বর্তমানে সেসব অনেকতাই প্রশমিত। প্রশাসনের সদা সতর্ক নজর সর্বত্র চোখে পড়ে। আবার শুরু হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শনার্থীদের আনাগোনা। যদিও তারই মধ্যে অমরনাথ শিবলিঙ্গ দর্শনে ভাতা পড়েনি। LTC-এর আনুকূল্যে ২০১১-র পুজোর ছুটিতে সপরিবারে রওনা দিয়েছিলাম ভূস্বর্গের আস্বাদনে। কাশ্মীর ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ সময় অক্টোবরের প্রথম তিন সপ্তাহ। এবাদেও অনেকে যান কাশ্মীরে বরফের খোঁজে। ভারতীয় রেলপথ জম্মুতেই ইতি (শ্রীনগর অবধি কিছুপথ সংক্ষেপ করে রেলপথ তৈরীর কাজ জোর কদমে চলছে)। তারপর বায়ুপথে ৭৫ মিনিট অথবা, সড়ক পথে ৩০০কিমি প্রায় ১০/১২ ঘন্টা শ্রীনগর তথা জম্মুকাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী (শীতকালে জম্মুতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়)। সড়ক পথ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে ভরা। অনেকগুলো পাহাড়িপথ ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে আবার নামছে। চলার যেন শেষ নেই। যাবার সময় সড়কপথে গেলেও, ফেরাটা বায়ুপথে হলেই ভালো হয়। তবে, বিমানের টিকিটটা বুঝেশুনে অনেক আগে থেকে করা উচিৎ। আমার বন্ধু তৎকালীন কোচবিহারের জেলা নিবন্ধক শ্রী নিতাই চরণ মাকর-এর ভাই কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবিভাগে কর্মরত ছিলেন। তাঁর সাথে অনেকবার টেলিফোনে কথা বলে, কাশ্মীরের সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে নিয়ে তবেই রওনা হয়েছিলাম। জওহর সুড়ঙ্গ অবধি সারাটা পথ চড়াই উৎরাই। কিন্তু তারপরই একদম সমতল। শ্রীনগর আসলে এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা (ভ্যালী)। যথারীতি চাষবাস, বসবাস বহাল তবিয়তে চলছে। কাশ্মীরের সৌন্দর্য অপরূপ। এখানেই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়। গ্রীষ্মে ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, আবার শীতে মাইনাস ৫ সেলসিয়াস (কারগিলে মাইনাস ২০—৪০ হয়ে যায়।) বৃষ্টিও হয় প্রচুর। কাশ্মীরিদের স্থানীয় ভাষা সংস্কৃত, পাঞ্জাবী ও ফার্সী মিশ্রিত ডোগরীভাষা। রাজতরঙ্গিনীতে পাওয়া যায় সম্রাট অশোক ধর্মযাত্রায় বেরিয়ে শ্রীনগরের ডাললেকের পাড়ে এসে পৌঁছান। কন্যা চারুমতী ডালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। গড়ে ওঠে বিহার আর জনপদ। চারদিকে পীরপাঞ্জল গিরিশ্রেণী ঘিরে রেখেছে শ্রীনগরকে—নৈসর্গিক শোভা মনে ধরে রাখার মতো। রামায়ণ মহাভারতে কাশ্মীরের প্রসঙ্গ মেলে। এখানে মৌর্যরাজ অশোক, কুষাণরাজ কণিষ্ক, সুলতান বংশ, মোগল বংশ, ব্রিটিশরা, শিখরা এবং ডোগরীরা বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করেছেন। সম্রাট শাহজাহান, জাহাঙ্গীর গড়ে তুলেছিলেন তাদের গ্রীষ্মাবাস। তারই চিহ্নস্বরূপ গড়েছেন নানান মনোরম উদ্যান, যথা—চশমাশাহী, নিশাতবাগ, শালিমার বাগ, নাসিমবাগ ইত্যাদি। শ্রীনগর যাবার পথে ভেরীনাগ। চশমাশাহীর প্রাকৃতিক প্রস্রবণের জল অনেকেই সংগ্রহ করছে এবং পান করছে। আমরাও কয়েক বোতল ভরে নিয়ে কয়েকদিন ধরে পান করেছি। সুমিষ্ট আস্বাদ খনিজ পদার্থ মিশ্রিত। জনশ্রুতি নেহরুজী নিয়মিত এর জলপানি করতেন। এই জলে অনেক ব্যাধির নাকি আরাম মেলে। কাশ্মীরের হৃদয়ের রাণী হল ডাল লেক। ডাল লেক, বড়া লেক আর নাগিনলেক মিলে ডাললেকের বিশাল ব্যাপ্তি। একদিকে বুলেভার্ড রোড, অপরপাড়ে সারি সারি প্রায় হাজারখানেক হাউসবোর্ট সাজানো। এই দেখে অনেকে একে পাশ্চাত্যের ভেনিস বলে থাকেন। ডাললেকে রয়েছে ভাসমান চাষ/শব্জীক্ষেত্র, রয়েছে সুদৃশ্য নেহরু পার্ক। ডালে চলছে অসংখ্য শিকারা। এই শিকারা বিহারের তুলনা নাই। চলতে চলতে অনেক বাণিজ্য শিকারীর নাগালে পড়তে হয়। এখানেই রয়েছে বড় বড় বোটে বিভিন্ন দোকান পসরা। শাল শাড়ীর বাহার। হাউস বোটে রাত্রিবাস এক

।কাগ্যাগাভ গিচ চায়ানন্ত চচ্যাশ্টিক
(য়াচ াদ্যাগাব লকাগ্রীাদ চাগুণ্ড চাচ্চ ল্যাকভাশী)

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। তবে সব বুঝে শুনে মনে হয়, হাউসবোটে না থাকাটাই উচিৎ। কারণ, হাজার হাজার যাত্রীর এবং বোটে বসবাসকারী কাশ্মিরীদের মল-মূত্র যুগযুগ ধরে সবই ডালের জলেই নিমজ্জিত হচ্ছে এবং ঐ জলেই স্নান, মুখধোয়া,

বাসনমাজা সবই হচ্ছে (রান্না ও খাবার জলের ব্যবহার সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে)। তবে, এসব চিন্তা করেও আমরা মাত্র একরাত বোটে ছিলাম, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। শ্রীনগরে নগরীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান-শঙ্করাচার্য মন্দির, ২৪২ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে মন্দির দর্শন করতে হয়। এখানে বসে শঙ্করাচার্য তপস্যা করেছিলেন। উপর থেকে নগরী এবং ডাললেক-সে এক সুন্দর দৃশ্য, দূরে বরফে ঢাকা পীরপাঞ্জালের গিরিশৃঙ্গ। তারপর রয়েছে মোগল সম্রাটদের তৈরী বিভিন্ন মনোরম উদ্যান। আর রয়েছে ডাললেকে শিকারা চেপে জলবিহার— এক সারা জীবনের সঞ্চয়। বহু সিনেমা/টি-ভি সিরিয়ালের শুটিং হয়েছে ডালে। কাশ্মীর ভ্রমণে হোটেল, গাড়ী, খাওয়া, বেড়ানো ইত্যাদি মিলিয়ে বেশ ভাল খরচ হয়। তিন-চারজনের পরিবার, ১৪/১৫ দিন বেড়ালে, সবমিলিয়ে লাখখানেক হলে ভালো হয়। ডালে জল বিহারের মধ্যেই সন্ধান মেলে কাশ্মীরের শাড়ী, শাল, মধু, কেশর ও শুকনো ফল। দাম কম নেই। দাম, গুণ ও মান বুঝেই কেনা যেতে পারে। বুলেভার্ড রোডে রয়েছে সব অভিজাত নামকরা দামী হোটেল। আমরা ছিলাম কোহনা ডালগেট এলাকার শেষের দিকে, কোলকাতার মানুষ শ্রী সমর চক্রবর্ত্তী পরিচালিত এক নিখাদ বাঙালি হোটেলে। খাওয়া —থাকা সবই মেলে এখানে। বাঙালি নামের লেবেল সেঁটে কেউ কেউ ব্যবসা করছেন। তবে সেগুলোর গুণগতমান সম্পর্কে সন্দেহ আছে। শবনম, ক্যাথে, সাহারা এসব নামে একই জায়গায় সমরবাবু হোটেল চালাচ্ছেন। আদর আপ্যায়ণ খাওয়া থাকা সত্যিই অতুলনীয়। বেড-টী থেকে শুরু করে লুচি, মিষ্টি, ছোলার ডাল, মাছ-মাংস, রাতের খাবার সব পাওয়া যায়। আমিষ, নিরামিষ, রাতে রুটি যে যেরকম চায়। বেড়াতে গেলে দুপুরের খাবার প্যাক করে দিতেও ভুলে যান না। এখানে থাকতে হলে ৪/৫ মাস আগে থেকে যোগাযোগ করলে ভালো হয়। ফোন নম্বর ০৯৫৯৬৫৩৭২১০ অথবা ০৯৪৩৩০২৮৩৬৭। কোলকাতার ছেলে বিগত ৩০ বছর ধরে সুনামের সাথে কাশ্মীরিদের সম্পত্তি লীজ নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কাশ্মীরিরা বাদে কেউ এখানে জমি বাড়ী কিনতে পারে না। আর রয়েছে হজরত মহম্মদের কেশ রক্ষিত পবিত্র হজরতবাল মসজিদ। মসজিদের ভেতরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই। সারা শ্রীনগর জুড়ে রয়েছে চিনারবৃক্ষ—এটি পারস্যদেশ থেকে আনা হয়েছিল। আর রয়েছে লক্ষাধিক টিউলিপ ফুলের বাগান—যা বছরে একবারই মার্চ মাসে মাত্র ১৫/২০ দিনের জন্য দেখা যায়। শ্রীনগরের বেকারী তৈরী খাবার নাম করা, যেমন—রুটি, টোষ্ট, লাভাস, কুলচা ও বাখরখানি বিখ্যাত। এছাড়াও নানান মিষ্টি জাতীয় খাবারও পাওয়া যায়। এখানকার "জান-বেকারী" প্রসিদ্ধ। একটি অপ্রচারিত দর্শনীয় স্থান রয়েছে— যার নাম "রোজাবল"। এটি একটি সমাধিমন্দির। কাশ্মীরিদের মতে এটি "ইউসা আসফ"—এর সমাধি স্থল। কিন্তু ঐতিহাসিক নাদিরীর মতে এটি আসলে যীশুখৃষ্টের সমাধিস্থল। তাঁর মতে ক্রুশবিদ্ধ হবার পর যীশুর মৃত্যু হয়নি। তাঁর রেজারেকশন হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেছিলেন। শত্রুর ভয়ে প্যালেস্তাইন থেকে ছদ্মবেশে গোপনে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে লাডাক হয়ে কাশ্মীরে আসেন এবং জীবনের ২/৩ অংশ এখানেই ছিলেন। বিস্তারিত জানতে শঙ্কুমহারাজ লিখিত হিমালয় ৩য় খণ্ড পড়তে হবে। শ্রীনগরকে কেন্দ্র করে দর্শনীয় স্থানগুলো সবই দেখে নেয়া যায়। বেড়াবার জন্য CAR বুকিং হয়। ভাড়া হাজার তিনেকের মধ্যে প্রতি ক্ষেত্রে। এছাড়াও সরকারী বাস রয়েছে। তবে সবই অগ্রিম বুকিং করতে হয়। জম্মু থেকে শ্রীনগর গাড়ীভাড়া ৫/৭ হাজার টাকা। গাড়ীর এসোসিয়েসন ভাড়া নির্ধারণ করে থাকে। তবে অনেক সময় একটু কমেও হয়ে যায়। পরের দিকে সিন্ধু, ঝিলম ও লিডার নদীর সৌন্দর্য অতুলনীয়। আমরা প্রথমে দূরে যাই সোনমার্গ। এখানেই নয়ন মুগ্ধকর খাজিয়ার গ্লোসিয়ার যার সৌন্দর্য ভোলার মত নয়। অনেকটা কাছ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। অনেকে পাগলের মতো ছুটে চলেছে ছুঁয়ে দেখার জন্য। এখান থেকে অমরনাথ দর্শনে যাবার পথ আছে। সোনমার্গ যাবার রাস্তায় প্রথমবার দেখতে পেলাম আপেল বাগান। অনেকেই গাড়ী থেকে নেমে ছবি তুলছে। আপেল কিনছে এবং খাচ্ছেও। কাশ্মীরে অনেক আপেল বাগানে গিয়ে আপেল খেয়েছি। কিন্তু এখানকার বাগানের আপেলের স্বাদ এতটাই মিষ্টি ও রসালো, যে না খেলে শুধু লিখে বোঝানো যায় না। আমাদের সাধারণ বাজারেও এই আপেল দেখা যায় না। গাছ থেকে সদ্য পেড়ে দেয়া আপেল

ডাললেক হাউসবোট।

সোনমার্গ যাবার পথে আপেল বাগান

সত্যিই স্বর্গীয় ও অনবদ্য। বন্দুক হাতে বাগানে পাহারা চলছে, কাউকেই অনেক অনুরোধ সত্বেও ঢুকতে দেয়া হল না। তবে, অন্য জায়গায় ২/৩টা বাগানে ঢুকে আপেল খেয়েছি—হাত দিয়ে ধরে ছবিও তুলেছি। এরপর গেলাম গুলমার্গ। পাহাড় আর পপলারে ঘেরা। সারা কাশ্মীরে সরলবর্গীয় বৃক্ষেরই প্রাধান্য। গুলমার্গেই রয়েছে এশিয়ার দীর্ঘ ও বিশ্বের উচ্চতম কেবল্‌কার। শীতকালে এখানে বরফের উপর স্কেটিং করা যায় ও স্লেজগাড়ী চলে। শ্রীনগর থেকে ২২ কিমি দূরে রয়েছে হিন্দুদের মন্দির ক্ষীরভবানী। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ পুজো দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের উল্লেখযোগ্য নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ডুব দেবার মত অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান হল পহেলগাও। যাবার পথে লিডার নদীর যাত্রাপথ নজরে পড়ে। এখান থেকে অমরনাথ যাবার রাস্তা আছে। তবে সেটা রাস্তা বলা ভুল। অসম্ভব দুর্গম পাহাড়ী পায়ে চলা পথ আছে। এখান থেকেই বৈশরণ যাওয়া যায়। যাওয়া যায় মিনি সুইজারল্যান্ডে। পাহাড়ে ঘেরা সবুজ উপত্যকা, প্রাকৃতিক শোভায় ভরপুর। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়াটা অতীব রোমাঞ্চকর। আর বারবারই ভয়ে বুক কাঁপে। ঘোড়াগুলো কেন যেন কঠিন এবড়ো খেবড়ো পথের খাঁজ ভাঁজগুলোকেই বেছে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। অনেকে ভয়ে চীৎকার করে।

পহেলগাও যাবার পথে লিডার নদী

মিনি সুইজারল্যান্ড। পহেলগাও থেকে যেতে হয়।

পহেলগাঁও যাত্রাপথে দেখা মিলবে পামপুর। এখানে জাফরান চাষ হয়। কেশর উৎপাদনে বিশ্বে দুনম্বর। প্রথম স্পেন। অক্টোবর মাসে জাফরান ফুল ফোটে। এর অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হতেই হবে। বেগুনি রঙের পাপড়ি, মাঝের ডাটাগুলো স্বর্ণাভ পীতাভ মিশ্রিত। এগুলোই হল কেশর। যা স্বাদে বর্ণে রান্নায় যুক্ত হয়। কেশর ইদানীং সৌন্দর্য চর্চার উপকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর নাম ৫০ হাজার টাকা কেজি বা তারও বেশী। অনেকে গাড়ী থেকে নেমে ছবি তুলে নেয় কিন্তু গাছে/ফুলে হাত দেওয়া নিষেধ, পাহারা থাকে। যাবার পথে আরও দেখা যাবে অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে বিষ্ণু ও শিব মন্দির ছিল। ৮৫৫-৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে কাশ্মীরের রাজধানী ছিল। যাবার পথে আরও দর্শনীয় স্থান রয়েছে। ১২ শতকেরও আগে রাজা জয় সিং-এর আমলে পাথরে তৈরী মমলেশ্বর শিব মন্দির। কাশ্মীর বিখ্যাত তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। আর রয়েছে শাল, পশমিনা, কেশর, বিভিন্ন ফুলের মধু, আপেল এবং শুকনো ফল। শুকনো ফল কাশ্মীরের সব জায়গায় পাওয়া গেলেও, এর পাইকারী ও শ্রেষ্ঠ বাজার হল "কাজিগুন্ড"। দেখে বুঝে দাম করে আসল জিনিসটিই কেনা উচিৎ। কাশ্মীরে আমার নজরে পড়েছে—কাশ্মীরিদের সৌন্দর্য, আর বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের দারিদ্র এবং রুজিরোজগারের অপ্রতুলতা। পর্যটন এখানকার সবচেয়ে বড় শিল্প। একে কেন্দ্র করে নানানভাবে কিছু রোজগারের হদিশ মেলে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় বেড়ানোর খরচ তুলনায় এখানে অনেকটাই বেশী মনে হয়েছে। কাশ্মীরে রয়েছে অসংখ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দর্শনীয় স্থান। এখান থেকেই সড়কপথে লে, লাডাক ও কাগিলল যাওয়া যায়। সব কিছু দেখতে হলে ১/১$^{১}/_{২}$ মাস লাগতে পারে। রাস্তা খারাপ থাকা সত্বেও আমরা সবুজে ভরা নির্জন উপত্যকা যুসমার্গে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানের সীমান্ত এখান থেকে খুব কাছে। এখানেই শেষপর্যন্ত জঙ্গী প্রভাব ছিল এবং তা মুক্ত করতে বেশ সময় লেগেছিল। চারপাশে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী, বরফঢাকা শৃঙ্গ দেখা যায়। জনশ্রুতি প্যালেস্তাইন থেকে লাডাক ও যুসমার্গ হয়ে যীশুখৃষ্ট কাশ্মীরে আসেন। বর্তমানে যুসমার্গে খুব বেশী যাত্রী নজরে নড়ল না। সরকারী ব্যবস্থায় থাকার জন্য সুন্দর কটেজ ও হোটেল আছে। কিন্তু ভ্রমনার্থী নেই। যুসমার্গ যাবার পথে দেখতে পাওয়া যায় চারার-ই-শরিফ, সুফি সাধক শেখ নুরউদ্দিন ওয়ালির সমাধির ওপর কাঠের তৈরী সুদৃশ্য মাজার। মুসলিমদের পবিত্রতীর্থ। ১৯৯৫ সালে এখানে জঙ্গীরা আশ্রয় নিয়েছিল এবং জঙ্গীমুক্ত করতে মাজার আগুনে পুড়ে যায়। পরবর্তীতে সরকারী অনুকূল্যে তা পুনরায় তৈরী হয়। বাড়ী ফেরার পথে গিয়েছিলাম অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির দর্শনে। সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে ২৪ঘন্টা নিখরচায় দর্শন ও যাত্রী আহারের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের মধ্যে "গ্রন্থসাহেব" গ্রন্থটিকে নিয়ম মেনে রোজ চলে সম্মান শ্রদ্ধা

পামপুরে জাফরান ফুল।

জানানো। অত্যন্ত পবিত্রতা ও নিষ্ঠার সাথে করসেবার মাধ্যমে এখানের সব কাজ হয়ে থাকে। আর গিয়েছিলাম পঞ্জাবের ওয়াঘা ও পাকিস্তানের আটারি সীমান্তে। দুদেশের সীমান্তরক্ষীদের সসম্মান সহাবস্থান এবং সূর্যাস্তে দুদেশের সুশৃঙ্খল ফৌজি প্যারেড ও জাতীয় পতাকা নামানোর দৃশ্য এক কথায় অতুলনীয় দেশপ্রেমের আবেগ ও বাস্তবরূপায়ণ। প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হয় রোজই। এই পথেই সড়কপথে দুদেশের মধ্যে মৈত্রী বাস যোগাযোগ রয়েছে।

সবদেখে শুনে মনে হয়েছে এই রূপসী কাশ্মীর এখানে ঈশ্বর আর শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিক রূপ-রসে ভরে রেখেছেন, আর তাতেই কি মুগ্ধ হয়ে তা ছিনিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় জঙ্গী-কার্যকলাপে ভূস্বর্গ তছনছ হয়ে যায়। কোনও মূল্যেই কোনদিন যেন কাশ্মীরের ভারতবিচ্ছেদে না ঘটে। এখানে প্রিপেইড মোবাইল পরিষেবা নেই, শুধুমাত্র পোস্টপেইড। এখানে ভারতীয় রেভেন্যু স্ট্যাম্প চলে না। আরও অনেক বাধা নিষেধের জালে আটকে আছে কাশ্মীর। অতীতে শ্রীনগরে খুব ধূমধাম করে একটাই শারদীয়া দুর্গাপূজা হতো। জঙ্গী কার্য কলাপের ভয়ে এখন সেটি বন্ধ হয়ে গেছে।

ট্রাউট মাছ।

কাশ্মীর ভারতের অর্ন্তভূক্ত হলেও, বহু কাশ্মীরিরা কিন্তু তা মনে করেন না। বরং তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে মিশে যেতে বেশী আগ্রহী। আমরা কাশ্মীরে পৌঁছে শুনেছি সেবছর জুনমাস পর্যন্ত ভ্রমণার্থীর সংখ্যা ৭ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। বাঙালি ভ্রমণার্থীর সংখ্যা প্রচুর নজরে পড়েছে। ভ্রমণনার্থী ছাড়া কাশ্মীরকে ভাবাই যায় না। ওদের ধারণা সেবছরে দর্শনার্থী ২০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে।

সব শেষে জম্মু সম্পর্কে সামান্য কিছু বলতেই হয়। শ্রীনগর যাবার আগে বা ফিরে এসে এক আধদিন ২/৪টে দর্শনীয় স্থান দেখলেই হয়ে যায়। শ্রীনগরে মুসলিমদের আধিক্য, তেমনি জম্মুতে ঠিক উল্টো। এখানে হিন্দুদের বসবাস বেশী। জম্মু সুন্দর সাজানো শহর। প্রায় সমতল। এখানে শ্রীনগর যাতায়াতের পথে একদিন/রাত কাটানোটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এখানে থেকেই অনেকে বৈষ্ণোদেবী, সিমলা, দিল্লী বা অমৃতসর গিয়ে থাকেন। দুর্গমপথের কথা ভেবে আমরা বৈষ্ণোদেবী যাইনি, অমৃতসর গিয়েছিলাম। জম্মুতে হোটেল ও খাবার খরচ অনেকটাই বেশী স্টেশনের কাছে না থেকে, শহরের মধ্যে রঘুনাথজী মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই মন্দিরের কাছাকাছি থাকাটা ভাল। বাঙালী খাবারের সমস্যা আছে। ছোটোখাটো কিছু দেখবার জায়গা আছে। তবে, সবই ৩/৪ ঘন্টার মধ্যেই সেরে নেয়া যায়। দেখেশুনে দরদাম করে শুকনো ফল, শীতবস্ত্র কেনা যেতে পারে।